সংবাদ

তারিখ: 21 AUG 2017 ... পৃ ... কলাম ...

শিক্ষার মানের পরিচায়ক কি গ্রেডিং পদ্ধতি?

ড. মিহির কুমার রায়

বাংলাদেশে ২০০১ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ২০০৩ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথম দিকে এ ফলের ব্যাপ্তি কিছুটা রক্ষণশীল হলেও সময়ের আবর্তে তার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে যার বহির্প্রকাশ সর্বোচ্চ গ্রেড এ+ পাওয়ার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। অর্থাৎ যারা সর্ববিষয়ে লেটার মার্ক (৮০+) পাবে তারাই এই কৃতিত্বের অধিকারী হবে। সমসাময়িক কালে এ গ্রেড নিয়ে সকল মহলে জল্পনা কল্পনা চলছে এবং এই আলোচনা আরও বাড়ে যখন এই দুই পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। এ ফল শিক্ষার্থীর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এরই হাত ধরে তারা উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করবে দেশে কিংবা বিদেশে। বিভিন্ন কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। এই গ্রেডিং পদ্ধতির আগে যারা সনাতনী কায়দায় পরীক্ষা সম্পন্ন করেছিল তাদের কাছে স্টার মার্ক কিংবা বোর্ড স্ট্যান্ড করা ছিল সোনার হরিণ এবং এই মানের ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানীয় লোকজন দেখতে আসত কিংবা স্কুল থেকে সংবর্ধনা দেয়া হতো। এখন এর পরিমাণ এত বেশি বেড়েছে যে কেউ কারও দিকে তাকিয়েও দেখে না কে জিপিএ-৫ বা এ+গ্রেড পেল। এত বহুল সংখ্যায় গ্রেড পাওয়ার পেছনে গুণগতমান যতটুকু দায়ী তার চেয়ে বেশি রয়েছে সরকারি নীতিমালা অর্থাৎ শিক্ষার হার বড় করে দেখানো। কিন্তু এসব সর্বোচ্চ গ্রেড ধারীরা যখন উচ্চ শিক্ষায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে অকার্যকর হয় (যেমন কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় দুজন উত্তীর্ণ হয়েছিল) তখন সার্বিক শিক্ষার মান নিয়ে দেশের প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরগরম হয়ে উঠে। শিক্ষার মান নিয়ে এই যে অবহেলা তা সমগ্র জাতিকে এক চরম সংকটে নিয়ে চলছে বলে নিরপেক্ষ গবেষক, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মীগণ মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সুপার নিউমারারী অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছিলেন শিক্ষা এখন প্রযুক্তির কাছে দায়বদ্ধ হয়ে গেছে, পড়াশুনার জন্য আর গ্রন্থাগারে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, ক্লাস ভিত্তিক শিক্ষার রেওয়াজ অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। এখন বিষয় ভিত্তিতে এক এক শিক্ষকের বাড়ি এক একটি কোচিং সেন্টার যেখানে শিক্ষা বাণিজ্য জমজমাট আর বেপারীর ভূমিকায় শিক্ষক। এই অবস্থার সৃষ্টি একদিনে হয়নি যা নিয়ে সরকার চেষ্টা করেও কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে পারেনি, প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করতে পারেনি আর কিছুদিন পর পর সরকার পদ্ধতিগত পরিবর্তনের পথ বেছে নিয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা শঙ্কিত। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গত জুলাইয়ে প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফলের মাধ্যমে।

এতে দেখা যায় যে, দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি-তে গড়ে পাসের হার ৬৮.৯১ শতাংশ যা গত বছর ছিল ৭৪.৫৪ শতাংশ। আবার দেখা যায় যে, জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৬৯ জন যা গত বছরের তুলনায় ২০ হাজার কম। তথ্য মতে, এ বছর ৮ হাজার ৭৭১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৭০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং মোট ৫৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ আর ৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তীর্ণের হার শূন্য। এখন প্রশ্ন উঠেছে এটা কি সার্বিক বিচারে ফল বিপর্যয় নাকি এটাই বাস্তবে মানসম্মত ফলাফল? এর কারণ খুঁজতে গিয়ে পাওয়া যায় নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ইংরেজি বিষয় ও এমসিকিউ অংশে পরীক্ষার্থীদের সাড়া হতাশাজনক অর্থাৎ একটি শিক্ষার্থীর ভিত্তির দুর্বলতা একটি লক্ষণ মাত্র যা একটু ঘুরিয়ে দিলেই বিপাকে পড়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এটি সত্য যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ফলাফল নির্ভর শিক্ষার্থীর মেধা তৈরি নির্ভর নয় যার ফলে সরকারের কৃতিত্ব নেয়ার প্রবণতা ও অভিভাবক পিতা মাতার অতি উৎসাহই দায়ী। কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পড়াশুনাটা অভিভাবকের শিক্ষার্থীর নয় যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর উপর অনেক কিছু চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষণীয় যেমন বিষয় নির্বাচন, প্রতিটি বিষয়ে টিউটর, শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়া ইত্যাদি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য জিপিএ-৫ পাওয়া যা তার উচ্চশিক্ষায় ভর্তিতে সহায়ক হবে।

কিন্তু সুধীজন বলছে শিক্ষার্থী কতটুকু শিখছে এবং সেই শিক্ষা তাকে আলোকিত মানুষ তৈরিতে কতটুকু সহায়তা করছে সেটা নিশ্চিত করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতি তা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। এবারকার ফলাফলে বিপর্যয় বিশেষত কুমিল্লা বোর্ডের শুধু ইংরেজি বিষয়ের কারণে অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোত চিত্র ভিন্নতর যেখানে দশম শ্রেণী শেষ করেই ইংরেজিতে বিশ্বমানের যোগাযোগ তৈরিতে সহায়ক হয়। অথচ এই ইংরেজি দুর্বলতার কারণে শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ভয়-আতঙ্কে দিন কাটায়। এই একটি বিষয়ে যে দুর্বলতা তার অন্যতম কারণ দেশে ইংরেজি শিক্ষকের স্বল্পতা ও শিক্ষার্থীর দুর্বল ভিত্তি। সরকার এই নির্ধারিত শিক্ষা বোর্ডের ফলাফলের বিপর্যয়ের জন্য একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এখন শুধু অপেক্ষার বিষয় ফলাফল কি পাওয়া যায়। সরকার এই বিষয়টিতে এত উদ্বিগ্ন কেন?

শিক্ষা বোর্ডগুলোর বিধিবদ্ধ কাজগুলোর অন্যতম কাজ হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিতকরণ ও ফল সঠিক সময়ে প্রকাশ করা। এখন কোন বছর কোন বোর্ডের শিক্ষার্থীর ফলাফলের হার কম হতে পারে– আবার কোন বছর বেশিও হতে পারে। এর ফলে বোর্ডকে দায়ী করা বা প্রশংসিত করা সমীচীন নয়। কারণ এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ যত কম থাকবে সঠিক নিরপেক্ষ ফলাফলের চিত্র তত বেশি পাওয়া যাবে যা এবারকার ফলাফলে কিছুটা প্রমাণিত হয়েছে। আশা করা যায় আগামীতে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার হারের চেয়ে শিক্ষার মান নিয়ে বেশি চিন্তিত।

পাঠ্যসূচি, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, উত্তর পত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদির উপর নীতিমালা প্রয়োজন সময়ের দাবি। তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি, পাশাপাশি অনুশীলন ভিত্তিক পাঠদান, সৃজনশীলতার চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি, পাঠ্য পুস্তকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থীর নিয়মিত পাঠাভ্যাস কেবল শিক্ষার মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। এই ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে। সরকার ডিজিটেল বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে আগাচ্ছে এর অর্থ প্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞান মনস্ক একটি শিক্ষা পদ্ধতি কিন্তু এই প্রযুক্তির অপব্যবহারের আলামত আমাদের শিক্ষার্থীদের বিপথে পরিচালিত করার আভাস দিচ্ছে যা কোন ভাবেই মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচায়ক নয়। এই ধরনের একটি পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য নৈতিক শিক্ষা জরুরি। যার শুরুটা হয় পরিবার থেকে পরবর্তীতে সম্পূর্ণ হয় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষকের কাছ থেকে। এরি মানদণ্ডে পরিশ্রমী শিক্ষার্থী অবশ্য ভালো ফল করবে, পাঠ্যক্রম উন্নত হলে ফলাফলের মানও বাড়বে বলে আশা করা যায়। তবে সরকার যেন গ্রেড ইনফ্লেশন দেখিয়ে কৃতিত্বের দাবিদার হবে এই ভাবধারা পরিত্যাগ করতে হবে এবং শিক্ষাকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে। শিক্ষার মানের পরিচায়ক উচ্চতর গ্রেড নয় এটা শুধু একটি উপলক্ষ মাত্র।

পাঠ্যসূচি, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, উত্তর পত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর নীতিমালা প্রয়োজন সময়ের দাবি। তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি, পাশাপাশি অনুশীলন ভিত্তিক পাঠদান, সৃজনশীলতার চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি, পাঠ্য পুস্তকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থীর নিয়মিত পাঠাভ্যাস কেবল শিক্ষার মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে

[**লেখক** : গবেষক ও ডিন, সিটি ইউনিভার্সিটি]
mihir.city@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................
তারিখ.................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর